পুণ্যপদপরশে

শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাধারায় অভিষিক্তা ‘রমণী’

অরিন্দম দাস

গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন, ধর্মস্থাপন, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ এবং সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন। এই ‘সাধু’ কি শুধু তাঁরাই, যাঁরা গৃহত্যাগ করে ঈশ্বরদর্শনের আশায় কঠোর তপস্যা করে চলেছেন? নিশ্চয়ই নয়। যাঁদের মধ্যে সাধুত্ব অর্থাৎ সততা, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরপরায়ণতা ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলি আছে—তাঁরা যে-অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ভগবান তাঁদের পরিত্রাণ করেন; তাঁদের মায়ার বাঁধন ছেদন করে, সমস্ত বাধা-প্রতিকূলতা দূর করে অন্তর্নিহিত সাধুত্বকে পূর্ণ বিকশিত করে তোলেন। সে-কারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় দেখা যায়, গৃহী দুর্গাচরণ নাগ সমকালে এবং একালেও বন্দিত হয়ে চলেছেন ‘সাধু’রূপে।

বস্তুত, মানুষের বাহ্য আচরণ বা অবস্থা দেখে সবসময় বোঝা যায় না, তার মধ্যে সাধুত্ব কোন মাত্রায় রয়েছে। বোঝেন শুধু অন্তর্যামী। সমাজে যাদের আমরা গুরুত্ব দিই না, অশ্রদ্ধা-অবজ্ঞা করি—তাদের মধ্যেও যে সাধুত্ব থাকতে পারে, তা আমাদের কল্পনাতীত। অন্তর্যামী ভগবান তাদের উদ্ধার করেন, প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বজনের শ্রদ্ধার আসনে। তাই তিনি পতিতপাবন। পূর্ব পূর্ব অবতারগণ বহু উপেক্ষিত অনাদৃত মানুষকে পরম করুণায় বুকে টেনে নিয়েছেন—ইতিহাস এর সাক্ষী।

পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। একদিন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ধ্যান করছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুতেই মায়ের শ্রীমূর্তিতে মন নিবিষ্ট হচ্ছে না। হঠাৎ দেখলেন, মা ভবতারিণী বারবনিতা ‘রমণী’র রূপ ধারণ করে পূজাঘটের পাশ দিয়ে উঁকি মারছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে ফেলেন মায়ের কাণ্ড দেখে; বলেন, ‘‘ওমা, আজ তোর ‘রমণী’ হতে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে!’’ পরবর্তী কালে ঘটনাটির উল্লেখ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে—‘বেশ্যাও আমি, আমি ছাড়া কিছু নেই!’ ’’[১]

ইষ্টদেবী ভবতারিণীকে সেদিন রমণীরূপে ‘পূজা’ করে প্রাঙ্গণে নেমে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কোনও একটি বিষয়ে চিন্তা করতে করতে চলেছেন। হঠাৎ শুনলেন এক নারীকণ্ঠ। দেখলেন, রমণী তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছেন ‘বাবা’ ‘বাবা’ বলে ডাকতে ডাকতে। গায়ে নানা অলংকার। বিস্মিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ‘‘ওমা, এইমাত্র যে তোমার কাঁচা মুখখানি দেখে এলুম গো, মায়ের মূর্তির পেছনে! মা কখন-যে কোন রূপে দেখা দেন, কে

জানে!" রমণী তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলেন, ''না, না, প্রণাম তো চলবে না। মাতৃরূপে দেখলুম, তুমি যে আমার মা।"[২] শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে মধুর 'মা' সম্বোধন শুনে চোখে জল এসে গেল রমণীর। বারবনিতা তিনি, অন্য সাধারণ মেয়েদের মতো স্বামীপুত্র নিয়ে সুখের সংসার তাঁর কপালে নেই। সেজন্য তাঁর মনে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ, যন্ত্রণা। এখন এই নরদেবতার মুখ থেকে 'মা' সম্বোধন শুনে তাঁর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এত সম্মান, এত শ্রদ্ধা, এত ভালবাসা! মুহূর্তের মধ্যে তাঁর আঁধার জীবন হাজার আলোর রোশনাইতে ভরে গেল।

আর একদিনের কথা। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে এসেছেন বিশিষ্ট ভক্ত বলরাম বসুর বাড়ির মহিলারা। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে বসে তাঁর অমৃতকথা শ্রবণ করছেন। এইসময় সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন রমণী। তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন : ''তুই আজকাল আসিস না কেন রে?" শ্রীরামকৃষ্ণ একজন বারবনিতাকে ডেকে কথা বলছেন দেখে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তাঁরা। কিছুক্ষণ পর তাঁদের নিয়ে তিনি গেলেন কালীমন্দিরে। মহিলারা সবিস্ময়ে দেখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ইষ্টদেবী ভবতারিণীকে বলছেন, ''মা, তুমি বেশ্যা রমণীর রূপ ধারণ করেছ। তুমি বেশ্যা ও সতী দুইই হয়েছ।" তাঁরা বুঝতে পারলেন, রমণীকে ঘৃণার চোখে দেখা তাঁদের উচিত হয়নি; কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে মাতৃজ্ঞানে কথা বলছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন—''তাঁদের নিজেদের সতীত্বের গর্ব করা উচিত নয় কারণ মায়ের ইচ্ছাতেই তা সম্ভব হয়েছে।"[৩]

বস্তুত, রমণীকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃজ্ঞান তাঁর অন্তর-বাইরের সকল কলুষ-কালিমাকে নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মাতৃভাব সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাব। এই ভাবের বিকাশ ঘটাতেই এবার ভগবান ও ভগবতী যৌথ লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মাতৃভাব ও শ্রদ্ধা যে কত গভীর এবং ব্যাপক তা রমণীর জীবনেতিহাস পাঠ করলে কিছুটা অনুমান করা যায়। এই ইতিহাস পরশমণির স্পর্শে লোহার সোনায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ইতিহাস।

রমণীর মধ্যে বাৎসল্য রসের ধারা বহুদিন ধরেই প্রবাহিত ছিল। বছর তেরোর বালক নীলকণ্ঠকে দেখে একদিন তাঁর মাতৃহৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল। রমণী তখন রামমোহন পাঁড়ের রক্ষিতা। ধনী ব্যবসায়ী রামমোহনের দোকানে খাতা লেখার কাজে নিযুক্ত হয়েছিল নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। বর্ধমানের ধরণী গ্রাম থেকে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন পিতৃব্য যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কারণ, নীলকণ্ঠের পিতা আকস্মিকভাবে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে সংসারে অভাব-অনটনের করাল ছায়া বিস্তৃত হয়, জমিজমা বিক্রি করে দিতে হয়, এমনকী আসবাবপত্রও বন্ধক দিতে হয়। তাতে কিছুকাল কাটলে সংসার চালানোর খরচ সামলাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে মুখোপাধ্যায় পরিবার। সংসারের হাল ধরতে বালক নীলকণ্ঠ কলকাতায় এসে রামমোহনের দোকানে খাতা লিখে যৎসামান্য অর্থ উপার্জন করতে থাকে। ইতিমধ্যে শিখে ফেলে সংস্কৃত ভাষা। তার ছিল সুরেলা কণ্ঠ ও গভীর সংগীতপ্রীতি। একদিন রামমোহনের অনুপস্থিতিতে খাতা লেখার কাজ সেরে আপনমনে গান গাইছিল নীলকণ্ঠ। অকস্মাৎ রামমোহন এসে পড়ায় নীলকণ্ঠ ভয়ে সংকুচিত হয়ে যায়, কিন্তু তার গান সামান্য শুনেই ভাল লাগে রামমোহনের। তাকে আবার গাইতে বলেন। মুগ্ধ রামমোহন স্থির করেন তাঁর প্রণয়িনী রমণীকে গান শুনিয়ে খুশি করার জন্য নীলকণ্ঠকে নিয়ে যাবেন তাঁর বাড়িতে। রমণী নিজেও ভাল গান গাইতেন। রামমোহনের বাড়িতে এসে নীলকণ্ঠ

যখন বৈষ্ণব কবি শশিশেখরের 'অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহ না' পদটি গাইল, রমণী তখন মুগ্ধ হয়ে গেলেন; রামমোহনকে বললেন নীলকণ্ঠকে খাতা লেখার কাজে আটকে না রেখে তার সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা করতে। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল সংগীতশিক্ষা করলে নীলকণ্ঠ অনেক দূর যেতে পারবে। তাকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন রামমোহন পাঁড়ে। রমণীকে খুশি করতে নীলকণ্ঠের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত পালাগায়ক গোবিন্দ অধিকারীর কাছে সংগীতের তালিম চলল নীলকণ্ঠের। বছর কয়েক পরে বাংলার কৃষ্ণযাত্রার অঙ্গনে অবিসংবাদী নায়করূপে আত্মপ্রকাশ করলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁর যাত্রাদলের মালিক হলেন তিনি। সংগীত, অভিনয় ও কবিত্বশক্তির মেলবন্ধনে নীলকণ্ঠ বাংলার মাটিকে ভক্তিরসের বন্যায় প্লাবিত করে দিলেন। তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা 'কালীয় দমন'। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা তাঁকে 'গীতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।[৪] তাঁর সত্তর বছরের আয়ুষ্কালে (১৮৪১-১৯১১) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহসান্নিধ্য লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গান শোনার জন্য ছুটে এসেছিলেন উত্তর কলকাতার হাটখোলার বারোয়ারিতলায়। গান শুনেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়িতে গিয়ে। আবার নীলকণ্ঠ স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে এসে গান শুনিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। কথামৃতে ১৮৮৪-র ৫ অক্টোবরের দিনলিপিতে দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উচ্চ প্রশংসা করে বলছেন, ''তুমি যাত্রাটি করেছো, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন।

''তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।...

''তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কি?—তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেছে।...

''সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁস। তুমি তাই মানহুঁস।''[৫]

বহুজন্মের ভাগ্যে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ সম্মান, স্বীকৃতি আর স্নেহাশীর্বাদ লাভ করেছিলেন নররূপে অবতীর্ণ ভগবানের কাছ থেকে। আর এই মহান প্রাপ্তির পিছনে ছিল রমণীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নীলকণ্ঠের চেয়ে তিনিও কিছু কম ভাগ্যবতী ছিলেন না। পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন লিখছেন,

''রমণী নামক বেশ্যা দক্ষিণশহরে।
বাৎসল্যের চক্ষে দেখে প্রভু গুণধরে॥
মা বলিয়া তাহারে সম্ভাষে প্রভুবর।
ত্রাতা পাতা জগতের অখিল-ঈশ্বর॥
কি বড় ভাগ্যের কথা বুঝে দেখ মন।
বিশ্বে ভাগ্যবতী হেন আছে কয়জন॥''[৬]

অক্ষয়কুমার সেন জানাচ্ছেন, রমণী মাঝে-মধ্যেই আঁচলে বেঁধে চাল ও কলাই ভাজা নিয়ে আসতেন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য এবং তিনি সাগ্রহে সেসব গ্রহণ করে আনন্দ সহকারে খেতেন। অক্ষয়কুমার সেনের উপলব্ধিজাত এক অমূল্য মন্তব্য :

''কার সঙ্গে রমণীর তুল্য ত্রিভুবনে।
চরণের রেণু আশ করে এ অধমে।''[৭]

একদিন দক্ষিণেশ্বরে নহবতের কাছে এসে রমণী বলে উঠলেন : ''কৈ গো আমার বৌমা, কোথায় তুমি? একবার দেখতে এলুম।'' শ্রীশ্রীমা বাইরে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁকে 'মা' ডেকেছেন—ইনি সেই রমণী। রমণী তাঁর চরণধূলি নিতে গেলে শ্রীশ্রীমা তাঁর হাত-দুখানি ধরে বললেন, ''সে হয় না, ঠাকুর তোমায় 'মা' ডেকেছেন, তুমি-যে আমার শাশুড়ী গো।'' উলটে

শ্রীশ্রীমাই তাঁকে প্রণাম করতে গেলেন মাতৃজ্ঞানে। বিস্ময়ে অভিভূত রমণী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, ''আমার এ সর্বনাশ আর করো না মা। তুমি আমার বৌমা, তুমি আমার মা, আমার ইষ্টদেবী। ছেলে আমায় মা বলে গ্রহণ করেছেন, তুমিও আমায় ধুয়ে মুছে নাও মা।''[৮] কাঁদতে লাগলেন রমণী। তাঁর প্রাণের ব্যথা জুড়োতে গিয়ে শ্রীশ্রীমাও তখন কাঁদছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সে এক অভাবনীয় দৃশ্য!

শান্ত হয়ে রমণী তাঁর আঁচল থেকে কিছু ভোজ্যদ্রব্য বের করে শ্রীশ্রীমায়ের হাতে দিলেন ঠাকুরসেবার জন্য। শ্রীশ্রীমা সানন্দে সেগুলি গ্রহণ করলেন। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী লিখেছেন, ''অনেকের আনীত দ্রব্যাদি খাইলে ঠাকুরের অতৃপ্তি হইত, পাকাশয়ে গোলযোগ হইত। তিনি সকলের দ্রব্য আহার করিতেন না, অনেকের দ্রব্য তাঁহার গলাধঃকরণ হইত না। মা বিশেষরূপেই তাহা অবগত ছিলেন। ইহা জানিয়াও তিনি এই রমণীর দ্রব্য গ্রহণ করিতেন এবং ঠাকুরও তাহা ভোজন করিতেন।''[৯]

দক্ষিণেশ্বরে যখন একের পর এক এমন অতুলনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়ে চলেছে, তখন বাইরের জগতে দেখি এর বিপরীত চিত্র। যেমন ধরা যাক বাংলার রঙ্গমঞ্চের কথা। সেখানে বারবনিতারা অভিনয় করতেন বলে তৎকালীন 'সভ্য', 'শিক্ষিত', 'ভদ্র' লোকেরা একে ঘৃণা করত; কেউ ঠিকানা জানতে চাইলে তারা জানলেও বলত না, কেননা সেটা মহা অপরাধ! 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্র ঘোষ বিশিষ্ট জনদের নিয়ে যে-কমিটি গঠন করেন, তাতে ছিলেন বাংলার অন্যতম প্রধান সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু মধুসূদন দত্তের আগ্রহে অভিনয়ের জন্য মহিলাদের গ্রহণ করা হলে সেই কমিটির সংস্রব ত্যাগ করেন বিদ্যাসাগর। কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্রও নাটকে বারবনিতাদের প্রবেশের বিরোধী ছিলেন।[১০] শিবনাথ শাস্ত্রী আসতেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। একসময় তিনি আসা বন্ধ করে দেন; কারণ হিসাবে বলেন : ''যাব কি, থিয়েটারের হীনচরিত্র লোকের সঙ্গে তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) সম্পর্ক, ওখানে আর আমাদের যাওয়া চলে না।''[১১] রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রধান জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে লিখছেন : ''রবীন্দ্রনাথ এত কাল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গদ্যে পদ্যে বহু রচনা লিখিয়া অবশেষে স্বয়ং সেই জিনিসটা সমর্থন করিলেন কী করিয়া? বাণী ও জীবনের মধ্যে এ অসংগতি কেন, তাহার সদুত্তর নাই।''[১২] রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন খুব কম বয়সে। প্রভাতকুমার আরও জানাচ্ছেন, শান্তিনিকেতনে ভোজনশালায় পঙ্‌ক্তি বিচার করে, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার করে সকলে খেতে বসত।[১৩] ব্রাহ্মণ ছাত্ররা অব্রাহ্মণ শিক্ষককে কখনও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না, শুধু হাতজোড় করে নমস্কার জানাত। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি পত্র-মাধ্যমে উত্তর দেন : ''সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে। এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।''[১৪]

এর বিপরীত দিকে কী দেখি? শ্যামাদাস কবিরাজ অসুস্থ রাধুকে দেখে চলে যাওয়ার সময় শ্রীশ্রীমা রাধুকে বলেন কবিরাজকে প্রণাম করতে। কবিরাজ চলে গেলে উপস্থিত কেউ কেউ মাকে জিজ্ঞেস করে : ''উনি কি ব্রাহ্মণ?'' মা বলেন, ''না, বৈদ্য।'' চমকে উঠে তারা জিজ্ঞেস করে : ''তবে যে প্রণাম করতে বললেন?'' শ্রীশ্রীমা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দেন : ''তা করবে না? কতবড় বিজ্ঞ! ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে

করবে?"[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা মানুষকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন—মানুষকে 'মানুষ' বলেই গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন; তার জাত, গোত্র, ধর্ম, অবস্থান নিয়ে তাকে ছোট করেননি। সারা বিশ্বে এমন উচ্চকণ্ঠে মানবতাবাদের জয়গান আর কেউ কখনও করেনি—শুধু উপদেশ দিয়ে নয়, স্বয়ং সেটি আচরণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর পতিতোদ্ধারের গুরুভারটি আপন স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই ছিল তাই। ১৮৮৬ থেকে ১৯২০—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মানবপ্রেমকে মাতৃত্বের রূপ ধরে প্রকাশিত হতে দেখি। শ্রীশ্রীমা যখন বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ি'তে, সেসময় একদিন বৃদ্ধা রমণীকে তাঁর কাছে আসতে দেখি। দীর্ঘকায়া, শ্যামাঙ্গী, হাতে কয়েকটি ফল। তিনি ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে দেখে ঘরের বাইরে গিয়ে ''মা এসেছ! এসো, এসো। কতদিন দেখিনি, কেমন আছ মা?" বলে ভিতরে নিয়ে এলেন। তাঁকে শাশুড়িজ্ঞানে একদিন প্রণাম করতে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা। সে বহুদিন আগে দক্ষিণেশ্বরে। সে যে সাময়িক আবেগপ্রসূত নয়, তা এবার দেখা গেল। এদিনও শ্রীশ্রীমা তাঁকে একইভাবে প্রণাম করতে গেলেন। রমণী ত্রস্তভাবে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, ''এখনো বেটীর আমাকে ফাঁসাবার বুদ্ধি গেল না! যে বাপের নাম আমি জপি, সেই বাপ যে দিবানিশি তোমার নাম জপেন। আর আমাকেই তুমি চাও কি-না প্রণাম করতে!"[১৬] একসময়ে যিনি বারবনিতা ছিলেন—তিনি কোন সুকৃতিবলে এই পরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন, আমাদের জানতে ইচ্ছে করে। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্যা গৌরী-মায়ের মুখে শুনি এমনতর অনুভবের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে কাকে গৌরী-মা বেশি ভালবাসেন—শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রশ্নের উত্তরে গৌরী-মা বলেছিলেন : ''রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী;/ লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,/ তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী।"[১৭] কোথায় সাধিকা গৌরী-মা, আর কোথায় রমণী! শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব করুণা ও আশীর্বাদ তাঁকে কোন মহত্তর লোকে উত্তীর্ণ করেছিল তা বাস্তবিক আমাদের কল্পনার অতীত।

রমণী প্রণত হয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি বললেন, ''না, না, তোমার প্রণাম নিতে পারবো না আমি। সে কিছুতেই হবে না।" বৃদ্ধা রমণী তখন শ্রীরামকৃষ্ণের পটের সামনে বসে আকুল হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ''বাবা, এত দয়া তোমার! এ আবাগীকে 'মা' বলে উদ্ধার করলে! আর কেন? এবার টেনে নাও কাছে।"

শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি ঠাকুরের কিছু আদেশ পেয়েছ মা?" শ্রীশ্রীমা বললেন, ''তুমি কিছু পেয়েছ?" আর কোনও কথা নয়, দুজনের মধ্যে নয়নে নয়নে কিছু বার্তা-বিনিময় হয়ে গেল। রমণীকে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যেতে বললে উল্লসিত রমণী বলে উঠলেন, ''এ তো ভাগ্যের কথা বৌমা! ঠাকুর খাবেন, তুমি খাবে; তারপর তোমাদের পেসাদ আমি পাবো। এই যদি তুমি দাও, তবে বসে রইলুম।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীশ্রীমা বললেন, ''আমারটা কি করে হবে? তুমি যে শাশুড়ী। তুমি ঠাকুরের পেসাদ পাবে।"[১৮]

আর একদিন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছিলেন পরম ভাগ্যবতী রমণী। এই তাঁর শেষ আসা। তিনি এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীমা কোনও আপত্তি না করে সেই প্রণাম গ্রহণও করলেন। হয়তো অন্যমনস্ক ছিলেন, কিংবা বুঝেছিলেন—আজ প্রণাম গ্রহণ না করলে রমণীর সারাজীবন আক্ষেপ থেকে যাবে। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবেই ভাবিত হয়ে যেন সেদিন রমণীকে কৃতার্থ করলেন। রমণীর সেদিন কী অসীম আনন্দ! আবেগে উচ্ছ্বাসে আপ্লুত রমণী শ্রীশ্রীমাকে বললেন, ''বৌমা, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যেমন লীলা করেছিলেন, এখন যে তুমি তেমনি ভাবে জীব তরাচ্ছ গো। তোমার লীলা দেখতে আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে ছুটে এসেছি। পরশু রাত্রে কাঁদছিলুম—'ঠাকুর, কত কাল তোমার কাছ-ছাড়া হয়ে আছি। কবে আবার যাবো তোমার কাছে, তেমনি করে তোমায় দেখতে পাবো?' ঠাকুর বললেন,—তোমার ভেতর দিয়েই এখন তিনি লীলা কচ্ছেন। তোমায় এসে দেখলেই আমার দুঃখু ঘুচবে। ওগো, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন,—যা,ওর কাছে যা, গেলেই আনন্দ পাবি। তাই আজ তোমার কাছে ছুটে এলুম মা।''[১৯]

শ্রীশ্রীমার মধ্যে রমণী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করলেন, অনুভব করলেন উভয়ের অভিন্নতা—এই সত্য উপলব্ধি সাধকগণের বহু তপস্যার ফলে ঈশ্বরকৃপায় একমাত্র সম্ভব হতে পারে। কোন সাধনায় এ-হেন অমৃতফল লাভ করলেন রমণী? শুধু তাই নয়, এযুগের অবিশ্বাসী, অহংকারী আর্ত মানবের কাছে উপস্থিত করলেন ত্রিতাপজ্বালা থেকে মুক্তির পথ—শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমায়ের শরণগ্রহণ। তাতেই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার চিরমুক্তি।

রমণীকে খুব পরিশ্রান্ত দেখে শ্রীশ্রীমা একখানি হাতপাখা নিয়ে এলেন বাতাস করবেন বলে। রমণী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে শ্রীশ্রীমাকে বাতাস করতে করতে কাতরভাবে বললেন, ''মাগো, এখন পথ খুলে দে, ছেলের কাছে চলে যাই।'' শ্রীশ্রীমা মৃদু হেসে বললেন, ''তিনি কি আর কিছু বাকী রেখেছেন?''

রমণী পরিতৃপ্ত মনে চলে গেলেন। শ্রীশ্রীমা বললেন, ''ভগবানের করুণা যখন আসে, তখন তা উত্তম অধম বিচার করে না।''[২০]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা এমনভাবেই বহু পাপী-তাপী, ঘৃণিত-ধিক্কৃত জীবনকে শান্তি ও আনন্দের অমৃতধারায় অভিষিক্ত করেছে। যেমন রতির মা, সারীবুড়ি, মোক্ষদামণি, মান্দার মা প্রমুখ। আড়িয়াদহে থাকতেন পদ্মরানি; পেটের দায়ে প্রথম জীবনে হীনবৃত্তি করলেও ঠাকুরের আশীর্বাদে তাঁর জীবনের গতিপথ বদলে গিয়েছিল। তাঁর একটি মেয়ে ছিল; সে বড় হতে তার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন পদ্মরানি। একদিন স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন। পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে কিছু বলার আগেই তিনি বলে ওঠেন : ''ওরে গান কর। কৃষ্ণের গান কর, মার গান কর। ভাবনা কি?'' পদ্মরানি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ মেনে নবদ্বীপে গিয়ে এক বৈষ্ণব বাবাজীর কাছে কীর্তনের তালিম নেন। তারপর কামারহাটিতে এসে থাকতে শুরু করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় কীর্তন গেয়ে অর্থোপার্জন করেন। সেইসময় বরানগর পাঠবাড়ি, বাচস্পতিপাড়া প্রভৃতি স্থানে সুমধুর কণ্ঠে ও অপূর্ব ভঙ্গিমায় কীর্তন পরিবেশন করে দর্শকগণকে মুগ্ধ করে রাখতেন তিনি। তাঁর কন্যাটি কলেরায় মারা যায়। বৃদ্ধবয়সে পদ্মরানি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় বসে আপনমনে কীর্তন গাইতেন। বাইরে কোনও এক জায়গায় গান গাইতে গিয়ে সজ্ঞানে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করে গেছেন আমৃত্যু।[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তখন রমণী প্রতিদিন চাঁদনির ঘাটে গঙ্গাস্নান এবং মা ভবতারিণীকে প্রণামের পর শ্রীরামকৃষ্ণকে দূর থেকে প্রণাম করে যেতেন, কোনও কোনও দিন দু-একটি কথাও বলতেন। এই নিয়ে সন্নিহিত অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে নানা বিরূপ আলোচনা শুরু হয়। কথাগুলি কানে যায় যোগীন মহারাজের, তিনি প্রতিবাদ করে বলেন, ''ঠাকুর নির্মল চরিত্র;

খোঁজ নিলেই পার।" সেই শুনে একজন রমণীর কাছে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কোনও কুপ্রশ্ন করে। ফিরে এসে সে তার বন্ধুদের যা জানায় তাতে রমণীর অপরূপ চরিত্র-মাধুর্য প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিটি তার বন্ধুদের বলে, ''তোমাদের পাল্লায় পড়ে আজ আমায় অপমানিত হতে হল। সে বলে, 'আমি দেহ বিকিয়েছি, কিন্তু এতই হীন নই যে, দেবচরিত্রে দোষ দেব। তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, আমার দেবতাকে অপমান কর।' ''[২২]

তাঁর জীবনদেবতাকে চিনে নিয়েছিলেন রমণী। তাঁর প্রতি ছিল রমণীর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও ব্যাকুলতা। রমণীর যত যন্ত্রণা, দুঃখ-বেদনা সবই কুসুম হয়ে ঝরে পড়েছিল সেই দেবতার চরণে। আর সেই দেবতা তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিলেন মানুষ থেকে দেবত্বে। এ-কারণেই পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ''Religion ... is a journey; but it is never a journey from Calcutta to Kedarnath. It is a journey from Bruteman to Buddha-man।''[২৩] কারণ, 'Each soul is potentially divine'।[২৪]

রমণীর জীবন তাই এক বারাঙ্গনা থেকে দেবী হয়ে ওঠার কাহিনি।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), ভাগ ২, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ৮৬

২। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, *সারদা-রামকৃষ্ণ* (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম : কলকাতা, ১৩৬১), পৃঃ ৯০-৯১ [এরপর, *সারদা-রামকৃষ্ণ*]

৩। সম্পাদনা ও সংকলন : স্বামী চেতনানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯), পৃঃ ৮১

৪। *উদ্বোধন*, ৯০ তম বর্ষ, সংখ্যা ৪, বৈশাখ ১৩৯৫, পৃঃ ২৪৬-৪৭

৫। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৬৩০-৩১

৬। অক্ষয়কুমার সেন, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৫), পৃঃ ৬১৭

৭। তদেব

৮। *সারদা-রামকৃষ্ণ*, পৃঃ ৯১

৯। তদেব, পৃঃ ৯১-৯২

১০। দ্রঃ সুস্মিতা ঘোষ, *বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০), পৃঃ ১০১

১১। তদেব

১২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী* (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৫), খণ্ড ২, পৃঃ৩৪

১৩। তদেব, পৃঃ ৫৭

১৪। তদেব

১৫। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৫), অখণ্ড, পৃঃ ৭০

১৬। *সারদা-রামকৃষ্ণ*, পৃঃ ১৯৯

১৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), ভাগ ২, পৃঃ ৪৯১ [এরপর, *ভক্তমালিকা*]

১৮। *সারদা-রামকৃষ্ণ*, পৃঃ ২০০

১৯। তদেব, পৃঃ ২০০-২০১

২০। তদেব, পৃঃ ২০১

২১। দ্রঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বরের মানুষ* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০৯) পৃঃ ১২৭

২২। *ভক্তমালিকা*, ভাগ ১, পৃঃ ১৬১-৬২

২৩। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১), পৃঃ ১৩৬

২৪। *The Complete Works of Swami Vivekananda* (Advaita Ashrama, 1989), Vol. 1, p. 124